বাংলাদেশে যুব-দারিদ্র: প্রকৃতি, ব্যাপ্তি ও দারিদ্র-বিমোচনে করণীয় প্রসঙ্গে[১]

ড. আবুল বারকাত

সারকথা : যুব-দারিদ্র বিষয়টি আমাদের দেশে সামগ্রিক দারিদ্র গবেষণায় অপেক্ষাকৃত স্বল্প গবেষিত বিষয়ের অন্যতম। প্রথমত: সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৪ কোটি মানুষের এ দেশে সবচে' কর্মক্ষম ও সৃজনশীল ৪ কোটি ৪০ লাখ যুবকদের ব্যাপকাংশকে উন্নয়ন-এর মূলধারা থেকে বঞ্চিতকরণের কারণে (exclusion of the excluded) যুব-দারিদ্র পরিস্থিতি ইতোমধ্যে প্রকট রূপ ধারণ করেছে; দ্বিতীয়ত: এ বিষয়ে বস্তুনিষ্ট বিশ্লেষণক্ষম তত্ত্ব-ভিত্তি আমাদের দেশে এখনো যথেষ্ট দুর্বল; তৃতীয়ত: যুব-দারিদ্র দূরীকরণের বিষয়টি যুবকদের ক্ষমতায়িত করার বিষয় হিসেবে নীতি-নির্ধারকদের কাছে ও রাজনীতিতে সম্ভবত কখনই কাঙ্খিত গুরুত্ব পায়নি; চতুর্থত: বিষয়টিকে মানব উন্নয়নের জীবন-চক্র কাঠামোর অঙ্গীভূত বিষয় হিসাবে না দেখে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার কারণে যুব-দারিদ্র বিমোচন এক ধরণের সম্ভাবনাহীন, কল্পনাতীত বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে; পঞ্চমত: 'যুব দারিদ্র' ধারণটি মানব উন্নয়ন কাঠামোর মধ্যে স্বাধীনতা-মধ্যস্থতাকারী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গ হিসাবে বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা প্রয়োজন। 'যুব দারিদ্র' বিষয়ে গতানুগতিক ধারার বিপরীতে একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করে 'যুব-দারিদ্র বিমোচন' বিতর্কের সূত্রপাত করাটাই এ প্রবন্ধের অন্যতম লক্ষ্য।

বহুমাত্রিক দারিদ্র ও মানব উন্নয়ন: ধারণা-কাঠামো সাজানো প্রয়োজন

'দারিদ্র' (poverty) ও 'উন্নয়ন' (development) অঙ্গাঙ্গি দু'টি প্রত্যয় (category)। 'দারিদ্র' ও 'উন্নয়ন' সংজ্ঞায়িত করা ও পরিমাপ করার ক্ষেত্রে গত তিন দশকের গবেষণায় বেশ পরিবর্তন লক্ষণীয়। 'দারিদ্র' অথবা 'উন্নয়ন' এখন আর একমাত্র মাথাপিছু আয়ের ব্যাপার নয়, এর সাথে 'মানব উন্নয়নের' (human development) ও 'মানবিক উন্নয়নের' (humane development) সকল মাত্রা সমন্বিত হয়েছে। ফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমাদের বর্তমান ধারণা কাঠামোটা অতীতের তুলনায় উচ্চতর স্তরে উপনীত হয়েছে।

'দারিদ্র' পরিমাপে সাধারণত: তিনটি সূচক ব্যবহৃত হয়ে থাকে: (১) জীবনকুশলতা (wellbeing) অথবা সামাজিক কল্যাণ (welfare), যেমন মাথাপিছু ক্যালরি ভোগ অথবা মাথাপিছু প্রকৃত ব্যয়; (২) নর্মাটিভ রেখা (normative threshold) অথবা দারিদ্রসীমা, অর্থাৎ সর্বনিম্ন একটি রেখা যার নীচে নামলেই ব্যক্তি অথবা পরিবার 'দরিদ্র' বলে বিবেচিত হবে; এবং (৩) মোট সূচক অর্থাৎ মাথাগণনা সূচক (headcount index) যার সাহায্যে মোট জনসংখ্যার কতভাগ দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থান করছে সেটা দেখানো হয়ে থাকে। নোবেল বিজয়ী অমর্ত্য সেনের মতে দারিদ্র পরিমাপের প্রচলিত এই মাথাগণনা পদ্ধতি দু'টো কারণে বিশেষ সমাস্যার সৃষ্টি করে। প্রথমত: এটি দারিদ্রসীমার নীচে অবস্থানকারী গরীবদের আয়ের কমতির মাত্রা দেখাতে অপারগ। ধনীদের আয় অপরিবর্তিত রেখে সকল গরীবের আয় কমিয়ে দিলেও এ মাথাগণনা সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত থাকে। দ্বিতীয়ত: এ পরিমাপ গরীবদের মধ্যে আয় বণ্টনের প্রতি অসংবেদনশীল, বিশেষত: গরীব থেকে ধনীতে আয়ের অবস্থানকারী গরীবদের আয় অসমতার (income inequality) ভিত্তিতে দারিদ্রের সূচক পরিমাপের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন। এই সেন সূচকই আজ মানব উন্নয়ন সূচক (human development index) পরিমাপে ব্যবহৃত হয়।

[১] *এ এল আর ডি, বেলা, নিজেরা করি* এবং *সমতা*-র সহযোগিতায় *এ ডি এস সি* আয়োজিত *"বাংলাদেশে যুব দারিদ্র: বর্তমান ও ভবিষ্যৎ"* শীর্ষক সেমিনারের জন্য রচিত মূল প্রবন্ধ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী অডিটোরিয়াম, ঢাকা: ২৮ শ্রাবণ ১৪১১/ ১২ আগস্ট ২০০৪

"দারিদ্র বিমোচনে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন" – যুক্তিটি আজ আর যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ দরিদ্রের আয়-হ্রাস করে অথবা অপরিবর্তিত রেখে ধনীদের আয় বৃদ্ধি করে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি সম্ভব। বিপরীতে যেটা যুক্তিসঙ্গত তা হ'ল 'মানব উন্নয়নের' কাঠামো যার মূল লক্ষ্য হ'ল জনগণের জীবনমান (quality of life) উন্নততর করা। আর এই জীবনমান যত না মাথাপিছু আয়ের ব্যাপার (যে রকমটি অধিকাংশ অর্থনীতিবিদেরা কিছুকাল আগেও বিশ্বাস করতেন এবং এখনও অনেকে বিশ্বাস করেন) তার চেয়ে অনেক বেশি যুক্তিগ্রাহ্য হল পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তিনটি সূচক: জীবনের গড় আয়ু (longevity/life expectancy)। জ্ঞান/শিক্ষা/দক্ষতা (knowledge, education, skill) ও প্রকৃত আয় (real income)। সুতরাং মানুষের বিকাশ বা মানব প্রকৃতির কার্য-কারণগত সম্পর্ক (causality) নির্ণয়ে সাধারণ অর্থনীতিবাদী ধারণার বিপরীতে একটি একীভূত বা সমন্বিত ধারণা (integrated concept)-র উদ্ভব ঘটেছে। ধারণাগত দিক থেকে পরিবর্তনটি আমূল বলা যায়। মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত এই ধারণা কাঠামোর ভিত্তিতেই যুব-দারিদ্রের প্রকৃতির বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ হতে পারে।

মানব উন্নয়ন ব্যাপারটা বিশেষ করে যারা বহিস্থ-বঞ্চিত অর্থাৎ দরিদ্র, নারী এবং যুবক তাদের পরিপূর্ণ জীবন যাপনের সুযোগ সৃষ্টির সমার্থক। মানুষ যেসব সত্যিকারের স্বাধীনতা উপভোগ করে সেগুলোর সম্প্রসারণ প্রক্রিয়াই মানব উন্নয়ন (Sen 1999)। কাজেই মানব উন্নয়নের সঙ্গে সহজাত যোগ রয়েছে 'একীভূতকরণ'-এর ধারণার। এটি শুধুমাত্র 'সম্পদ'-এর সঙ্গেই যুক্ত নয়। মানব উন্নয়নের জন্য দরকার সকল ধরণের অ-স্বাধীনতার (un-freedom) উৎস নির্মূল করা, সে জন্যে দরকার সত্যিকারের ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়ায় অক্ষমতায়িতদের সক্রিয় অংশগ্রহণ (প্রতীকি অংশগ্রহণ নয়)। এখানে বলে রাখা জরুরি যে, ক্ষমতায়নের ডিসকোর্সটি জটিল। এর সঙ্গে অনেক ব্যষ্টিক এবং সামাজিক অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। ক্ষমতায়নের প্রশ্নটিকে কেবলমাত্র আইনি অধিকার অথবা অর্থনৈতিক দরকষাকষি ক্ষমতার নিরিখে দেখা উচিত নয়। কেননা ক্ষমতায়নের রয়েছে অনেক ব্যক্তিগত এবং সাংস্কৃতিক মাত্রা।

মানব উন্নয়ন ও দারিদ্র (বিমোচন) পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। দারিদ্র একটি বহুমাত্রিক বিষয়। এ কারণে দারিদ্রের বহু ধরণের সংজ্ঞা চালু আছে এবং পরিমাপেরও রয়েছে নানা পদ্ধতি। অর্থনীতিবিদ ও নীতি বিশ্লেষকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অর্থের মাপকাঠিতে দারিদ্রকে মাপতে প্রলুব্ধ হন। ধরে নেওয়া হয়, ব্যক্তির জীবনযাত্রার বৈষয়িক মানদণ্ডই তার অবস্থার উন্নতি নির্দেশ করে। এভাবে দরিদ্রদের শনাক্ত বা চিহ্নিত করা হয় দারিদ্রসীমা নামক তথাকথিত একটি বৈষয়িক মাত্রা দিয়ে (Atkinson 1987,1989; Ravallion 1992)। এ মাত্রার নিচে আয় বা ব্যয়কারী ব্যক্তিকে দরিদ্র বলা হয়। কিন্তু আয় এবং ব্যয় পরিমাপ করাটা যেমন অতো সহজ নয়, তেমনি এ পরিমাপ যথেষ্টও নয়। এর সঙ্গে নানান জটিলতা যুক্ত হয়ে আছে। এ কারণে ইদানিং অর্থনীতিবিদরা খানার জীবনকুশলতা (household welfare) পরিমাপের বিকল্প অনার্থিক (non-monetary) পদ্ধতি অনুসন্ধান করছেন। এর মধ্যে বহুল উচ্চারিত পদ্ধতিটি হল খানার সম্পদ সূচক (household asset)। এটি হল– একটি সুনির্দিষ্ট গার্হস্থ উপকরণের প্রাপ্যতা বা সেটির মালিকানা লাভের সুযোগের যোগফল (Filmer and Pritchett 1998; Montgomery et.al. 2000; Sahn and Stifel 2000)। এটা এখন সবাই স্বীকার করেন যে, খানার আয় বা ব্যয়ের ওপর ভিত্তি করে দারিদ্রের পরিমাপ একটি স্থবির-স্থির (static) ধারণা। এ ধারণা একটি পরিবারের জীবন কুশলতার খুব সীমিত একটি চিত্র নির্দেশ করে। আয়ের ওপর সাময়িক কোনো আঘাত আসছে বলে বিবেচনা করলে একটি পরিবার তাদের স্থাবর সম্পত্তি যেমন জমি, ঘরবাড়ি বা স্থায়ী পরিসম্পদ ইত্যাদি সংরক্ষণের স্বার্থে তাদের খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারে বা স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পোশাক-আশাকের পেছনে ব্যয় হ্রাস করতে পারে। যদি এ আঘাত জীবন মানের ওপর স্থায়ীভাবে প্রভাব ফেলে সেক্ষেত্রে পরিবারটি তাদের সম্পদ যেমন স্থায়ী উপকরণ, গয়নাগাটি, গবাদিপশু, অথবা জমি ইত্যাদির মালিকানা বর্জনে বাধ্য। বাংলাদেশে মানুষের জীবনযাত্রার ওপর দুর্ভিক্ষের প্রভাব পরীক্ষা করে আগারওয়াল (১৯৯১) এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, শুধু সম্পদের মালিকানা বা খাদ্যের পেছনে ব্যয়, পুষ্টির মাত্রা, খানার ব্যয়ের ওপর মনোনিবেশ করা হলে জীবন-কুশলতার একটি ভ্রান্ত চিত্র পাওয়ার আশঙ্কা

রয়েছে। এর চাইতে বিপন্নতা (vulnerability) এবং জীবন-পরিচালন কৌশল (livelihood strategy) নির্ণয়ের মাধ্যমে দারিদ্র পরিমাপের পদ্ধতিটি দারিদ্র সম্পর্কে অনেক বেশি গতিশীল (dynamic) ধারণা দেয় (Falkingham and Namazie 2002)। এ পদ্ধতিগুলোয় জীবনযাত্রার মানের ওপর আঘাত এলে সে আঘাতের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে পরিবারের ক্ষমতা পরিমাপ করা হয়। এভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্যে পরিবার নানারকম উদ্যোগ নেয়। তারা শুধু শ্রমই দেয় না, সেই সঙ্গে বিনিয়োগ করে মানব পুঁজিতে (স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা), করে ভৌতিক বিনিয়োগ (গৃহায়ন, উপকরণ ও জমি), সামাজিক পুঁজি এবং এবং অপরাপর সম্পদ সুদৃঢ় করে (যেমন বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বন্ধন ইত্যাদি), জমা করে (খাদ্য, অর্থ কিংবা মূল্যবান উপকরণ যেমন গয়নাগাটি) ইত্যাদি।

আর্থিক মানদণ্ড যে একটি সার্বিক মাপণি নয়, এটি যে ব্যষ্টির সমৃদ্ধির অনেক গুরত্বপূর্ণ দিক, যেমন কম্যুনিটি সম্পদ, সামাজিক সম্পর্ক, সংস্কৃতি, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ ইত্যাদি তুলে ধরতে ব্যর্থ হয় এ উপলব্ধি থেকে আরও বেশ কয়েকটি সম্পূরক সূচক উদ্ঘাটিত হয়েছে যেগুলোর লক্ষ্য মানুষের সামর্থ্য তুলে ধরা (Sen 1985, 1987; Mckinley 1997; Micklewright and Stewart 2001)। সামর্থ্য-দারিদ্র (capability poverty) ব্যক্তির সুস্থ-সমর্থ জীবনযাপনের ক্ষমতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, এটি বিবেচনা করে পরিহারযোগ্য রোগবালাই পরিহার করার সামর্থ্য ব্যক্তির আছে কিনা, পর্যাপ্ত পুষ্টি পাচ্ছে কিনা, বিভিন্ন বিষয়ে ব্যক্তি কতখানি ওয়াকিবহাল বা তার সম্পর্কে অন্যরা কতখানি ওয়াকিবহাল, তার সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা আছে কিনা, সে কতখানি ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভোগ করছে এবং কতটা মুক্ত ও সক্রিয়ভাবে সমাজে মিশতে পারছে। এসব কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে একটা সময় পর্যন্ত বৈষয়িক সম্পদের দরকার পড়ে বটে, কিন্তু শুধু এগুলোই সবটা নয়। কাজেই সামর্থ্য-দারিদ্র মাপার সময় খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয় ক্রয়ের ক্ষমতা নির্দেশকারী দারিদ্রের আর্থিক মূল্যমান ভিত্তিক (money-metric) পরিমাপ যেমন নেওয়া হয় তেমনি সরকারি সম্পদে অভিগম্যতা, সম্পদ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ ইত্যাদিও বিবেচনায় নেওয়া হয়। বিভিন্ন সামর্থ্য মাপার মাধ্যমে দারিদ্র সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যেমন ধরা যাক ওজন স্বল্প শিশুর শতকরা হার। আবার বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা সামর্থ্য প্রয়োগের উপায় বিচারের মাধ্যমে পরোক্ষভাবেও সামর্থ-দারিদ্র পরিমাপ করা যায়। যেমন, শিশুর জন্মের সময় প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর প্রাপ্যতা কিংবা শিক্ষা বা সরকারি চাকুরির প্রাপ্যতা ইত্যাদি। সামর্থ্য-দারিদ্রের এই পরিমাপ জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যেও নির্দেশ করা হয়েছে (নিচের বক্স দেখুন)।

সহস্রাব্দ সন্মেলনে নির্ধারিত উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এম ডি জি)

১. চরম দারিদ্র ও ক্ষুধা দূরীকরণ
২. অভিন্ন প্রাথমিক শিক্ষা
৩. লৈঙ্গিক সাম্য ও নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি
৪. শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস
৫. মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন
৬. এইচআইভি/এইডস,ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ
৭. টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণ
৭. উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি বৈশ্বিক অংশিদারিত্ব সৃষ্টি

দারিদ্রের উপাদানগুলোর ক্রমপ্রসারমানতাকে 'দারিদ্র ধারণার পিরামিড'এর সাহায্যে দেখানো সম্ভব। এ পিরামিডে প্রতিটি ধারণা জীবন কুশলতার বিভিন্ন মাত্রার প্রতিনিধিত্ব করে। আবার প্রতিটি ধারণা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার সমাবেশ সৃষ্টি করে। এভাবে প্রতিটি সমাবেশ ক্রমশ স্ফীত এবং আরো জটিল আকার ধারণ করে (নিচের চিত্র দেখুন)। দারিদ্রের প্রথাগত 'অর্থনৈতিক' ধারণা বাউলখের পিরামিডের তৃতীয় ঘরে প্রত্যক্ষ করা যাবে; অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগ (consumption) যোগ অভিন্ন সম্পদ ও রাষ্ট্রের সরবরাহ করা পণ্য-সেবা। তবে রাষ্ট্রের সরবরাহ করা পণ্যের ভোগ এবং অভিন্ন সম্পদের প্রাপ্যতা পরিমাপ করার ক্ষেত্রে জটিলতার কারণে

প্রায় ক্ষেত্রে শুধু ব্যক্তিগত ভোগের বিষয়টিই মনোনিবেশ করা হয়। এর বিপরীতে অমর্ত্য সেন স্বাধীনতা, মুক্তি, স্বশাসন এবং মানব-মর্যাদাকে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ এবং অন্যান্য ধারণাকে গৌণ করে দেখিয়েছেন। এখানে মনে রাখতে হবে, দারিদ্র বিষয়ক অবধারণ যতো জটিল হবে ততোই এটির পরিমাপ কঠিন।

চিত্র ৪: দারিদ্র ধারণার পিরামিড

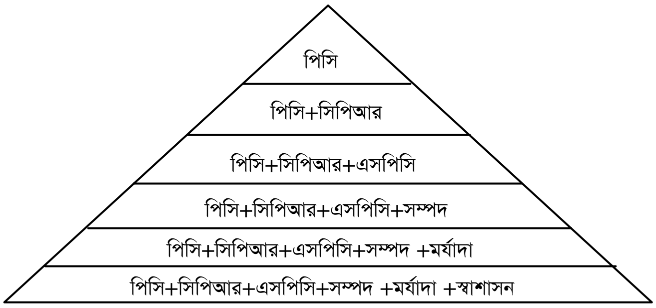

উৎস: Baulch, 1996
পিসি = ব্যক্তিগত ভোগ (private consumption); সিপিআর = অভিন্ন সম্পদ (common property resources); এসপিসি = রাষ্ট্রের সরবরাহকৃত পণ্য-সেবা (state provided commodities-services)

দারিদ্রের অপরাপর বিকল্প ধারণাগুলো এটি পরিমাপের অজস্র পদ্ধতিগত প্রচেষ্টা মাত্র (McGee and Brock 2001)। এর মধ্যে রয়েছে ধ্রুপদি নৃতাত্বিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে জাতিগোষ্ঠিগত অনুসন্ধান (Scott 1985, McGee 1998), অংশগ্রহণমূলক দারিদ্র মূল্যায়ন (Norton 2001), দীর্ঘমেয়াদি গ্রাম পর্যবেক্ষণ (Jayaraman and Lanjouw 1998) এবং প্রথাগত খানা ভিত্তিক জরিপ (Grosh and Munoz 1996, Grosh and Glewwe 2000)। এসব বিকল্প ধারণা এবং পদ্ধতিসমূহের মধ্যে কোনটা বেশি কার্যকর, সেটা অনেকটা নির্ভর করে দারিদ্র ও বঞ্চনার কোন দিক বিশ্লেষণ করা হবে তার ওপর।

দারিদ্রের প্রশ্নটি বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে বিচার করা দরকার: দরিদ্র লোকেরা বঞ্চনার একটি ফাঁদের মধ্যে আটকা পড়ে (নিচে চিত্রের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে) এবং সত্যিকার মানব উন্নয়ন ঘটাতে হলে বহিস্থ মানুষ অর্থাৎ দরিদ্র ও বঞ্চিতদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে এই ফাঁদটি ছিন্ন করে ফেলতে হবে। মানুষের স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করার মাধ্যমে উন্নয়নের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরিহার করা সম্ভব: এসব দৃষ্টিভঙ্গিতে গড় জাতীয় উৎপাদন বা ব্যাক্তিগত আয় বৃদ্ধি বা শিল্পায়ন বা প্রাযুক্তিক অগ্রগতি বা আধুনিকায়নের সঙ্গে উন্নয়নকে এক করে দেখা হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি বা ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি একটি সমাজের সদস্যদের ভোগ বা আধুনিকতার আরো বিস্তৃতি ঘটানোর ক্ষেত্রে হয়তো একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। কিন্তু স্বাধীনতা অন্য আরো কিছু নিয়ামকের ওপর নির্ভরশীল, যেমন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিন্যাস এবং রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার। যেমন শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে স্বাধীনভাবে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেওয়ার অধিকার ইত্যাদি। একইভাবে শিল্পায়ন বা প্রাযুক্তিক অগ্রগতি বা সমাজের আধুনিকায়ন মানুষের স্বাধীনতার অনেকখানি বিস্তার ঘটাতে পারে। উন্নয়ন যদি স্বাধীনতা নামক ব্যাপারটির বিস্তার ঘটিয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিশেষ কোনো প্রভাবক বা উপকরণের তালিকার কথা বিবেচনা না করে বিস্তারের লক্ষ্যটির ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা যায়। পরিমেয় স্বাধীনতার বিস্তার হিসেবে উন্নয়নকে বিবেচনা করলে সেই সব লক্ষ্যের ওপর মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়, যেগুলোর কারণে উন্নয়ন সত্যি দরকারি বলে বিবেচিত হয়।

বিশ্বায়নে বাংলাদেশের যুবক

বিশ্বায়ন এবং তার সংশ্লিষ্ট অভিঘাত বাংলাদেশের যুবকদের উপর প্রচণ্ড কুপ্রভাব ফেলেছে। বিশেষকরে যুবকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বর্তমানে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদের আবির্ভাবে বিশ্বায়ন-ঘনিষ্ট

অসম প্রতিযোগিতা, অর্থপুঁজা, উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন, বিদেশ সংস্কৃতির হস্তক্ষেপ, রাজনীতি ও অর্থনীতির দুর্বৃত্তায়ন– এসব কিছুই লুণ্ঠন সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে; সমাজে দারিদ্র এবং বৈষম্যতা স্থায়ীভাবে জেঁকে বসেছে। সমগ্র বিশ্বে আজ যুবকরা খুব বেশি বিপন্ন এবং এইচআইভি/এইডস্-এর মত প্রচণ্ড ঝুঁকিপূর্ণ স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বদভ্যাসের সাথে জড়িত। যুবকদের মধ্যে লাগামহীন হতাশা এবং দারিদ্রের ফলে সমাজে অপরাধ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম বেড়েছে। অশ্লীলবৃত্তি, মাদকাসক্তিও যুবকদের নৈতিক ও আদর্শগত মূল্যবোধ ধ্বংস করেছে। বাংলাদেশের মেধাবী যুবকদের একটা বড় অংশ উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে অবস্থান করছে কিন্তু এদের অধিকাংশই আর দেশে ফিরে আসছেনা। এতে করে মেধা পাচার ও মেধা প্রাপ্তির অবশিষ্ট দাঁড়ায় শূন্য (নেগেটিভ)।

চিত্র : বিশ্বায়নে যুবক

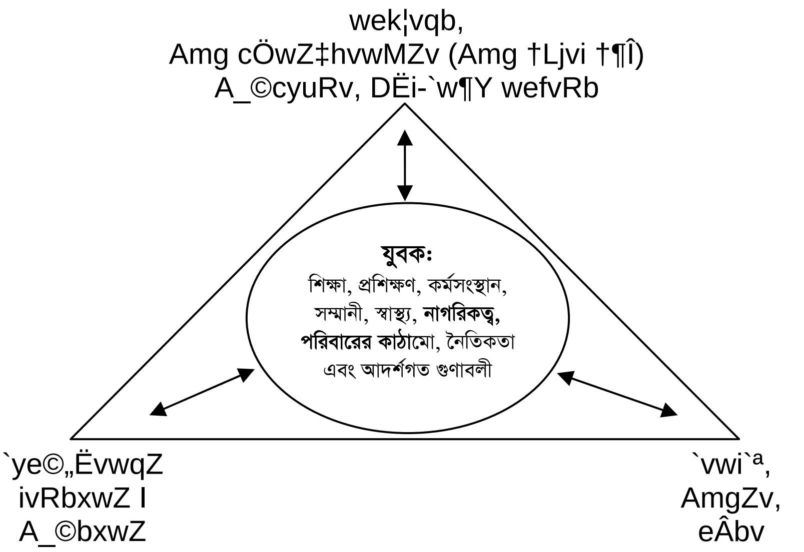

চিত্র: বিশ্বায়নে যুব দারিদ্রের ফাঁদ: সম্প্রসারিত রূপ

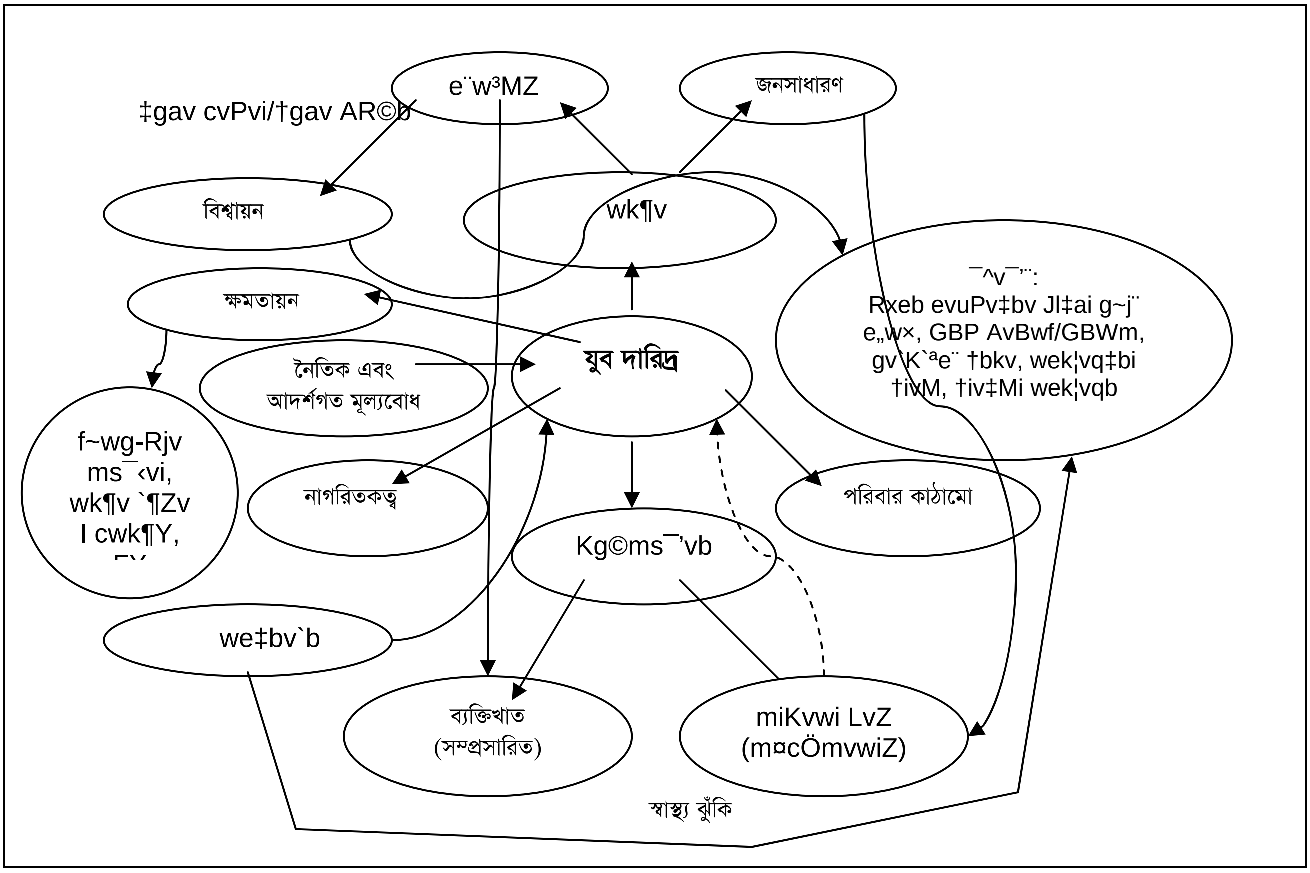

মানব উন্নয়নের বিষয়বস্তু মানুষ, তারা যে জীবনকে মূল্যবান মনে করে সেই জীবন বেছে নেওয়ার সুযোগ সম্প্রসারণ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, প্রযুক্তিক অগ্রগতি– এগুলো সবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এগুলো হল লক্ষ্য পুরণের উপায় মাত্র, এগুলো লক্ষ্য নয়। এগুলো মানব উন্নয়নে ভূমিকা রাখে কিনা, তা নির্ভর করবে এগুলো মানুষের চয়নের সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখে কিনা, যে পরিবেশে মানুষ তাদের সম্ভাবনার পরিপুর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে এবং সৃষ্টিশীল জীবন যাপন করতে পারে (মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০২, ইউএনডিপি)। তাই মানুষের পছন্দের বিস্তৃতি ঘটানোর মূলনীতি হল মানুষের সক্ষমতার বিকাশ ঘটানো: মানুষ যতদূর পর্যন্ত করতে পারে তার বা যা হতে পারে সেটিই তার সক্ষমতা। মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মৌলিক যে সক্ষমতা সেটা হল একটি দীর্ঘ এবং সুস্থ জীবন যাপন করা, শিক্ষা লাভ করা, একটি সম্মানজনক জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্যে প্রয়োজনীয় সম্পদের প্রাপ্যতা লাভ করা এবং কমিউনিটিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাওয়া। মানুষের মর্যাদা নিশ্চিত করা বলতেও বোঝায় যে, তারা স্বাধীন হবে এবং যেসব আইন ও প্রতিষ্ঠান মানুষকে শাসন করে সেগুলি তৈরি ও তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। যে দরিদ্র মানুষটি তার সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে পারে না, মাঠে কাজ করতে পাঠাতে বাধ্য হয়- সে মানুষটি মানব উন্নয়নের ছোঁয়া পায়নি।

এজন্যে বলা হচ্ছে প্রকৃত মানব উন্নয়ন হল স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠ। স্বাধীনতা-ঘনিষ্ঠতার অর্থ অ-স্বাধীনতার (un-freedom) প্রধান উৎসগুলো তিরোহিত করা। অ-স্বাধীনতা হলো: দারিদ্রের পাশাপাশি স্বৈরাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের স্বল্পতার পাশাপাশি বিধিবদ্ধ সামাজিক বঞ্চনা, সার্বজনীন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি নিপীড়ক রাষ্ট্রের অসহিষ্ণুতা বা মাত্রাতিরিক্ত তৎপরতা। সার্বিকভাবে ধনসম্পদের নজিরবিহীন বৃদ্ধি সত্ত্বেও সমসাময়িক বিশ্বে বিপুল সংখ্যক মানুষকে – হয়তো অধিকাংশকেই – মৌলিক স্বাধীনতার অধিকারগুলো থেকে বঞ্চিত করা হয়। কখনও কখনও বস্তুগত স্বাধীনতার অভাব সরাসরি অর্থনৈতিক দারিদ্রের কারণ হয়ে ওঠে যা মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তি, পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগাড়, অর্জনের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়। অন্যদিকে আবার নাগরিক সুযোগ-সুবিধা এবং সামাজিক যত্ন যেমন মহামারি প্রতিরোধ কর্মসূচি, স্বাস্থ্যসেবা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সাংগঠনিক উদ্যোগ বা স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অনুপস্থিতির প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে ওঠে অ-স্বাধীনতা।

বস্তুত, মানুষ যা অর্জন করতে পারে তা অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক ক্ষমতা এবং সুস্বাস্থ্য, মৌলিক শিক্ষা ও উদ্যোগের প্রতি উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়। বিপরীত ক্ষেত্রে এসব সুযোগ-সুবিধার প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজনও আবার প্রভাবিত হয় মানুষের স্বাধীনতার চর্চা, সামাজিক বাছাই, এবং এসব সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহিত যৌথ সিদ্ধান্তে অংশ নেয়ার অধিকার প্রভৃতির দ্বারা। বৃহত্তর জনগোষ্ঠি অর্থাৎ বহিস্থ বিপন্ন ও বঞ্চিত মানুষকে উন্নয়নের 'কেন্দ্রে স্থাপন'-এর জন্যে এসব আন্ত সম্পর্ক অনুধাবন করা জরুরি।

বস্তুত, স্বাধীনতার পাঁচটি স্বতন্ত্র রূপ আছে। এগুলো হল (১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (২) অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, (৩) সামাজিক সুযোগ, (৪) স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা, এবং (৫) সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা। এসব বৈশিষ্টপূর্ণ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার প্রতিটিই মানুষের সাধারণ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এসব স্বাধীনতা একে অপরকেও সহায়তা করে এবং এভাবে একটি মিথষ্ক্রিয়া তৈরি করে। এ পাঁচ প্রকার স্বাধীনতা একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যেমন ধরা যাক রাজনৈতিক স্বাধীনতা – যা ঘটে মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে– অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সৃষ্টিতেও সহায়তা করে। সামাজিক সুযোগ-সুবিধা, যার প্রকাশ ঘটে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধায়, তা অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে সহায়তা করে। আবার অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা, যার প্রকাশ ঘটে বাণিজ্যে, উৎপাদনে অংশীদারিত্ব এবং সরকারি সম্পদের (যেমন খাস জমি) প্রাপ্যতায়, তা ব্যক্তিগত প্রাচুর্যের পাশাপাশি সামাজিক সুযোগ-সুবিধার জন্যে সরকারি সম্পদ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম। ক্ষমতায়নের সবচেয়ে স্বাভাবিক শর্ত হল এই পাঁচটি স্বাধীনতার সবকটির মুক্ত ক্রিয়া।

অধিকারভিত্তিক ক্ষমতায়নের দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে দেখা যায়, সত্যিকার মানব উন্নয়নের চ্যালেঞ্জগুলো হল লাগাতার ও মহামারী আকারের বঞ্চনার অবসান এবং ভয়াবহ নিঃস্বতা প্রতিরোধ, যা বস্তুত স্বাধীনতার অভাব থেকে উৎপন্ন হয়। এখানে, যেমনটা আগেও বলা হয়েছে, স্বাধীনতা বলতে ৫টি উপকরণগত স্বাধীনতার সবকটিকেই বোঝায়। রাজনৈতিক স্বাধীনতার অর্থ শাসনকাজ নির্বাহকারীদের বাছাই এবং শাসনের নীতিসমূহ নির্ধারণ, কর্তৃপক্ষের কাজের সমালোচনা, অগণতান্ত্রিক শাসনের জন্য দোষারোপ করার অধিকার, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং সেন্সরবিহীন সংবাদপত্র পাওয়ার সুযোগ থাকা। অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তীব্রতা যতো বাড়ে, রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্খাও ততোই বাড়ে, একটুও কমে না (Sen 1999)। স্বাধীনতার দ্বিতীয় প্রকারভেদটি হল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা দিয়ে বোঝায় সেইসব সুযোগ-সুবিধা যা উৎপাদন, বিনিময় বা ভোগের পেছনে অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহারের সময় ব্যক্তি উপভোগ করে। একজন ব্যক্তি কোনসব অর্থনৈতিক স্বত্বাধীকার বা হকের (entitlement) অধিকারী হবে, তা নির্ভর করবে সম্পদের মালিকানা ও প্রাপ্যতা এবং বিনিময়ের শর্তসমূহের ওপর। স্বাধীনতার তৃতীয় প্রকারভেদটি হল সামাজিক সুযোগ-সুবিধা। এটি দিয়ে বোঝায় এমনসব বন্দোবস্ত সমাজ যেগুলো তৈরি করে দেয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি অর্জনের জন্যে। এইসব অর্জন ব্যক্তির ভালোভাবে বেঁচে থাকার বস্তুগত স্বাধীনতা ভোগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়ন নিপীড়িত কতিপয় গোষ্ঠি বা ব্যক্তির সামাজিক সুযোগ-সুবিধার ইতিবাচক প্রভাব বহুগুণে হ্রাস করে দেয়। স্বাধীনতার চতুর্থ প্রকারভেদটি হল স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা। এটি দিয়ে বোঝায় এক মুক্ত অকপটতা অর্থাৎ কোনো কিছু ভঙ্গ করলে মানুষের জীবনে ভীষণ নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ভিত্তিহীন নিয়ম-কানুন, বিধিমালা, পরস্পরবিরোধী দাপ্তরিক দলিলপত্র, জনগণকে তাদের অধিকার সম্পর্কে অনবগত রাখা – এগুলো স্বচ্ছতার অভাবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা না থাকলে জনগণকে নিপীড়ন করা, দুর্নীতি, গোপন লেনদেন, অপশাসন এবং মহামারি পর্যায়ে বঞ্চনাকে দীর্ঘায়িত করার পথ সুগম করা হয়। স্বাধীনতার পঞ্চম প্রকারভেদটি হল সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা বস্তুগত পরিবর্তনের কারণে বহু মানুষ অরক্ষিত, নাজুক এবং বঞ্চিত হয়ে আছে। তাদের জীবনে এসব পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। স্বয়ং অর্থনৈতিক কাঠামোর ফলাফল হিসেবে বা রাজনৈতিক বা অন্যান্য কোনো প্রকারের বিচ্ছিন্নতার ফলাফল হিসেবেও সুরক্ষামূলক নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সুরক্ষামূলক নিরাপত্তা দেওয়া বলতে বোঝায় শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন। যেসব স্বাধীনতার কথা বলা হলো তাদের সবকটিই এমন কিছু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলে যেগুলো ব্যক্তিমানুষ বা শ্রেণী, লিঙ্গ, সংস্কৃতি, গোষ্ঠিগত পরিচয়, ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি অভিন্ন পরিচয় দ্বারা চিহ্নিত সম্প্রদায়ের সাধারণ কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এইসব স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা হলে আমাদের সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, জনমিতিক, রাজনৈতিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে ভয়ানক ভারসাম্যহীনতা নেমে আসে। আর এসবেরই সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো বাংলাদেশের যুবক, বিশেষত: দরিদ্র যুবক।

মানব উন্নয়ন সূচকের নিরিখে শ্রীলংকা ব্যতিত দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় সবদেশের অবস্থানই নিম্ন পর্যায়ে। পুষ্টি, শিশুমৃত্যু ও স্বাক্ষরতা – এসব সূচকেই বাংলাদেশের মানব উন্নয়ন অবস্থান অত্যন্ত পশ্চাৎপদ। জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হ্রাসের ক্ষেত্রে আমরা কিছুটা উন্নতি করলেও শ্রমশক্তির প্রবৃদ্ধির যে উচ্চহার (যার অধিকাংশই যুব গোষ্ঠির বিষয়) তার সরাসরি অর্থ হ'ল – দ্রুতালয়ে শ্রমঘন অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিকল্প নেই। আবার এ কথাও সত্য যে বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে মোট প্রজনন হার হ্রাস পাওয়ার বদলে বৃদ্ধি পাচ্ছে। হতে পারে তা আয়-স্বল্পতার কারণে (income constraint) এবং/অথবা বংশপরম্পরা সম্পদ প্রবাহ উল্টোমুখী (life style constraint due to reverse intergenerational resource flow) হবার কারণে (Osmani 2003)। সেইসাথে একথাও সত্য যে প্রতিবছর বাংলাদেশে শ্রমবাজারে যে ৩০ লাখ মানুষ সংযোজিত হন তাদের মধ্যে কমপক্ষে ২০ লাখ মানুষ তেমন কোনো কাজ পান না। 'মাথাগণনা' হিসেবেও আমাদের দারিদ্রাবস্থা অত্যন্ত অসন্তোষজনক। এক্ষেত্রে যুবগোষ্ঠি সম্ভবত সবচে' বেশি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত। আমরা অন্যদের তুলনায় কমসময় বেঁচে থাকি এবং আমাদের শিশুরা অন্য সবার চেয়ে পুষ্টিহীনতায় বেশি ভোগে। খাওয়ার পানির ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা না'কি সবার চেয়ে ভাল, কিন্ত আর্সেনিক দূষণ এর মাত্রা যোগ করলে অবস্থা নিম্নমুখী হতে

বাধ্য। নিরক্ষরতা সূচকটি, বিশেষত: যুবগোষ্ঠির মধ্যে যে মাত্রায় বিস্তৃত তা থেকে একথা বলা যায় যে ব্যাপক যুবগোষ্ঠিকে নিরক্ষর রেখে আর যাই হোক তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্ষমতায়ণ (empowerment) নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। একথা নিশ্চিতভাবে বলছি এজন্য যে শিক্ষার সাথে দারিদ্রের সম্পর্কটি এমন যে নিরক্ষরতা দারিদ্রাবস্থা জিইয়ে রাখে এবং কার্যকরী স্বাক্ষরতা বৃদ্ধি দারিদ্রাবস্থা থেকে উত্তরণ ত্বরান্বিত করে। সুতরাং, সামাজিক চয়নের (social choice) এ বিষয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য।

সারণি ৩৮: মানব উন্নয়ন অবস্থা ১৯৯৬: বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশ

সূচক	বাংলাদেশ	ভারত	নেপাল	পাকিস্তান	শ্রীলঙ্কা	দক্ষিণ এশিয়া
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	১২১.৬	৯৪৩.২	২২	১৩৩.৫	১৫.৩	১২৬৪.০
মাথাপিছু আয় (US$)	২৬০	৩৮০	২২০	৪৯০	৭৮০	৩৮০
দারিদ্র: মাথা গণনা সূচক (মোট জনসংখ্যার শতাংশ)	৩৬	৩৫	৪২	৩৪	২২	-
জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার (%)	১.৬	১.৭	২.৫	২.৯	১.৩	১.৯
শ্রমশক্তি প্রবৃদ্ধির হার	২.১	২.০	২.৪	৩.৩	২.০	২.১
শহুরে জনসংখ্যা (মোট জনসংখ্যার হার) %	১৮	২৭	১৪	৩৫	২২	২৬
জীবনের গড় আয়ু (বছর)	৫৮	৬২	৫৫	৬০	৭২	৬১
শিশুমৃত্যু (প্রতি হাজার জীবিত জন্মে)	৭৭	৬৮	৯১	৯০	১৬	৭৫
শিশু অপুষ্টি (৫ বছরের নিম্নে %)	৬৭	৬৩	৭০	৪১	৩৮	-
সুপেয় পানির সুযোগ (জনসংখ্যার %)	৯৬৯	৬৩	৪৮	৬০	৫৭	৬৩
স্বাক্ষরতা (১৫ বছর ও উর্ধ্বের %)	৩৮	৫২	২৭	৩৮	৯০	৫০
প্রাথমিক স্কুল গমন (স্কুলগামী বয়সীদের %)	৯২	১০২	১০৯	৬৯	১০৫	৯৮

উৎস: *World Bank Economic and Social Database*

বাংলাদেশের যুবক: বর্তমান থেকে ২০২০ সন

আদমশুমারীসহ অন্যান্য পরিসংখ্যানে যাদের বয়স ১৫ বছর থেকে ৩০ বছর তাদেরকে যুবক বলা হচ্ছে।[2] বাংলাদেশের মোট যুব (১৫ থেকে ৩০ বছর বয়সী) জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লাখ, যা আমাদের মোট জনসংখ্যার ৩১.৪ ভাগ।[৩] অর্থাৎ প্রায় প্রতি তিনজনের একজন যুবক। আমাদের দেশের যুব জনসংখ্যা ক্যারিবিয় দ্বীপপুঞ্জের ১৭-টি দেশের মোট জনসংখ্যার সমান। আমাদের দেশের যুবকদের মোট সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার দ্বিগুণেরও বেশি। আমাদের দেশের যুব জনসংখ্যা আলজেরিয়া, সুদান, স্পেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, তাঞ্জানিয়া, কানাডা, আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ইরাক, মালয়েশিয়া-এর যে কোনো দেশের মোট জনসংখ্যারও বেশি। সুতরাং সহজেই অনুমেয় যে আমরা মানুষের সংখ্যাগত দিক থেকে শুধুমাত্র যুব-জনসংখ্যার নিরিখেই উল্লেখ্য যে কোনো দেশের মোট জনসংখ্যার চেয়ে অধিক সংখ্যক মানুষ নিয়ে কথা বলছি।

যুবকের সংজ্ঞা
জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী যুবক হ'ল ১৫-২৪ বছর বয়সীরা। যুবকদের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বয়স সীমা ধরে নিয়ে থাকে। যেমন মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ১৫-৪০ বছর, ব্রুনাই ১৫-৩৫ বছর, ভারত ১৫-৩৪ বছর, পাকিস্তান ১৮-৩০ বছর, হংকং ১০-২৪ বছর। বাংলাদেশ, সিংগাপুর ও শ্রীলংকার ক্ষেত্রে ১৫-৩০ বছর।

উল্লেখ্য যে, আজ ২০০৭ সালে যারা যুবক (অর্থাৎ যাদের বয়স ১৫ থেকে ৩০ বছর) তাদের জন্ম হয়েছে মুক্তযুদ্ধ পরবর্তী ১৯৭৩ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে। অর্থাৎ আজকের যুবকদের প্রায় সকলেই জন্ম গ্রহণ করেছেন স্বাধীন দেশে তবে সামরিক স্বৈরাচারী শাসনের মধ্যে আর দীর্ঘস্থায়ী স্বৈর-আচারি পরিবেশ যদি

[2] জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী যুবক হ'ল ১৫-২৪ বছর বয়সীরা। যুবকদের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন বয়স সীমা ধরে নিয়ে থাকে। যেমন মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে ১৫-৪০ বছর, ব্রুনাই ১৫-৩৫ বছর, ভারত ১৫-৩৪ বছর, পাকিস্তান ১৮-৩০ বছর, হংকং ১০-২৪ বছর। বাংলাদেশ, সিংগাপুর ও শ্রীলংকার ক্ষেত্রে ১৫-৩০ বছর।

[৩] ২০০১ সালের আদমশুমারীর তথ্যের ভিত্তিতে প্রবন্ধকার কর্তৃক হিসেবকৃত। ২০০৪ সালের হিসেব প্রক্ষেপিত। প্রক্ষেপণে জনসংখ্যার বয়স-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধির হার ব্যবহার করা হয়েছে।

মানুষের আচার পরিবর্তন করে থাকে তাহলে তাও সম্ভবত: ঘটেছে আজকের যুব সমাজে। সেইসাথে জন্মেই যখন দেখছে অর্থনৈতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন তাও তো প্রভাবিত করবে যুব-চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। আর সেই সাথে আজকের যুবকদের পরিণত বয়সে এসেছে অসম বিশ্বায়ন আর তথ্য প্রযুক্তি বিপ্লব। এসবই যুবকদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা রাখছে। সুতরাং জন্মসূত্রেই আজকের যুবক ও বয়োজৈষ্ঠ্যরা (যাদের বয়স ৫০ উর্ধ্ব) সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী দু'টি বৈশিষ্ট্যের বাহক। সময়কালের নিরিখে জন্মসূত্র ছাড়াও আরো একটি 'সাধারণ বৈশিষ্ট্য' আছে যা যুবসমাজের অধিকাংশের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য– সেটা হল 'দারিদ্র'। আজকের যুবকদের বৃহদাংশের ক্ষেত্রে দারিদ্রের এই দুষ্টচক্রের শুরু হ'ল মাতৃগর্ভের অপুষ্টি থেকে। অশিক্ষা-কুশিক্ষা, কর্মসংস্থানের অভাব, অদক্ষতা, নিকৃষ্ট আইন শৃংখলা কাঠামো, সুস্থ মানসিক বিকাশের প্রতিবন্ধক বিভিন্ন উপাদান, ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও পেশী শক্তির অনাকাঙ্খিত বিস্তার, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য রহিত, ধন-পূঁজা, ধন ও সম্মান সমার্থক হওয়ার পরিবেশ, সাংস্কৃতিক-দৈন্যদশা এসবের মধ্য দিয়েই বিকশিত হচ্ছে যুব সমাজ। শৈশব-কৈশোর যার ঐ দুষ্টচক্রের মধ্যে আবর্তিত তার যৌবন কেমন হতে পারে?

আমাদের ৪ কোটি ৪০ লাখ যুবক মোট জনসংখ্যার ৩১.৪ শতাংশ, যাদের প্রায় ৮০ শতাংশ গ্রামে বসবাস করেন। যুব-জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি (৫২%) মহিলা। আর এই মহিলাদের ৭৫ শতাংশ বিবাহিতা, আর পুরুষ যুবার ৩৪ শতাংশ বিবাহিত। বিষয়টি ভবিষ্যৎ মোট জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ববহ। কারণ ১৫-১৯ বছর বয়সী যুবকদের যেখানে ৫ শতাংশ বিবাহিত সেক্ষেত্রে এ গ্রুপের প্রায় ৫০ শতাংশ যুবতী বিবাহিতা; ২০-২৪ বছর বয়সী যুবকদের মধ্যে যেখানে ৩১ শতাংশ বিবাহিত সেক্ষেত্রে এ-গ্রুপের প্রায় ৮৭ শতাংশ যুবতী বিবাহিতা; আর ২৫-৩০ বছর বয়সী যুবকদের যেখানে ৭৫ শতাংশ বিবাহিত সেক্ষেত্রে এ-গ্রুপের যুবতীদের ৯৮ শতাংশ বিবাহিতা। যুবতীদের অপেক্ষাকৃত স্বল্পবয়সে বিয়ে করার ফলাফল একদিকে যেমন ভবিষ্যৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে, অন্যদিকে তেমনি ঐ বয়সে গর্ভধারণ প্রসূতি মা ও সদ্যজাত সন্তানের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ, যা মাতৃমৃত্যু ও শিশুজন্মের হার বৃদ্ধি করে। শেষ পর্যন্ত মানব উন্নয়নের প্রথম সূচক 'গড় আয়ূ' হ্রাস পায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, যে বয়সে যুবতী মেয়ের (১৫-১৯ বছর) মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষার জন্য যাওয়ার কথা সে বয়সে ৫০ শতাংশ যুবতী বিয়ে করতে বাধ্য হচ্ছে। আমি মনে করি বিষয়টি আমাদের দেশের যুবতীদের পছন্দ/অপছন্দের কারণে ঘটছে না, বিষয়টি সামাজিক চয়নের অ-স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রেও আগের যুক্তির মতই, সমাজ ও রাষ্ট্রের সক্রিয় ভূমিকা অপরিহার্য। এদিক থেকে দেখলে অবশ্যই বলতে হয় যে মেয়েদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসার কর্মসূচি মানব উন্নয়নে ও দারিদ্র বিমোচনে সুদরপ্রসারী ও বংশপরম্পরা ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বাংলাদেশের যুব-জনসংখ্যার প্রক্ষেপণ (projection)-এর দিকটি ভবিষ্যতে যুব দারিদ্রের ব্যাপ্তি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া ও নীতিনির্ধারণের জন্য গুরত্বপূর্ণ। বিষয়টির কয়েকটি জরুরি দিক সারণি ৩৯-এ দেখানো হয়েছে। গত চার দশকে– ১৯৬১ থেকে ২০০৪ – বাংলাদেশের মোট জনসংখ্য বেড়েছে ২.৫ গুণ কিন্তু যুব-জনসংখ্যা বেড়েছে ৩.৫ গুণ। আর আগামী ১৫ বছরে মোট জনসংখ্যা ও যুব জনসংখ্যা উভয়ই বাড়বে ১.৫ গুণ। ২০২০ সাল নাগাদ আজকের ৪ কোটি ৪০ লাখ যুবকদের জায়গা দখল করবে প্রায় ৬ কোটি ১০ লাখ যুবক, যেটা ১৯৬১ সনে আমাদের মোট জনসংখ্যারও বেশি। এখানে অত্যন্ত যুক্তিসংগত প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে যেভাবে মোট জনসংখ্যার তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাচ্ছে সে ধরণের কোনো কিছু যুব-জনসংখ্যা হ্রাসের ক্ষেত্রে চিন্তা করা যায় কিনা? প্রথমেই বলে নেয়া যেতে পারে যে যেহেতু ২০২০ সাল আসতে এখনও ১৫ বছর বাকী আর যুবকদের বয়স শুরু ১৫ বছর থেকে সেহেতু জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেলে যুব-জনসংখ্যাও তুলনামূলকভাবে হ্রাস পাবে। আর এ বিষয়েও অন্যান্য বয়স-গোষ্ঠির তুলনায় বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুবকদেরই ভূমিকা প্রধান। অনেক কারণের একটি কারণ এমন হতে পারে যে ১৫-১৯ বছর বয়সী যুবকদের ৯৫ ভাগ আর ঐ একই বয়সী যুবতীদের ৫০ ভাগ এখনও অবিবাহিত। সুতরাং বর্তমান ও ভবিষ্যতের যুবক-যুবতীদের বিয়ের বয়স যদি বৃদ্ধি পায়, অথবা বিবাহিতরা যদি স্বল্পসংখ্যক সন্তানে সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে ভবিষ্যতের জনসংখ্যায় তার প্রভাব উন্নয়নমুখী হতে পারে। কিন্তু এর কোনোটিই যুব-দারিদ্র বিমোচন না করে

সম্ভব নয়। কারণ শিক্ষা ও কর্মসংস্থান যুব-দারিদ্র বিমোচনের প্রধান মাধ্যম, আর প্রশিক্ষিত ও কর্মে নিয়োজিত যুব-দম্পতিদের মোট প্রজনন হার অন্যান্যদের তুলনায় কম।

সারণি ৩৯: বাংলাদেশের যুব-জনসংখ্যার (১৫-৩০ বছর) কয়েকটি দিক: ১৯৬১-২০২০

নির্দেশক	১৯৬১	১৯৭৪	১৯৮১	১৯৯১	২০০৪	২০২০
মোট জনসংখ্যা (হাজারে)	৫৫২২৩	৭৬৩৯৮	৮৯৯১২	১১১৪৫৫	১৪০০০০	১৯০০০০
যুব জনসংখ্যা মোট (হাজারে)	১২৭২৯	১৬৭৭৬	২২১৩৭	২৮৩৩৬	৪৪০০০	৬০৮০০
মোট জনসংখ্যার শতাংশ	২৩.১	২২.০	২৪.৬	২৫.৪	৩১.৪	৩২.০
মহিলা-পুরুষ অনুপাত	৯৭.১	১০১.৯	৯৯.১	৯৩.৮	১০৯.৫	১০২.৫

উৎস: প্রবন্ধকার কর্তৃক পঠিত: ESCAP High Level Meeting March 24-27, 1998 Bangkok.

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে আজকের ২০০৪ সালের যুব-জনসংখ্যা ৪ কোটি ৪০ লাখ থেকে ২০২০ সালে ৬ কোটি ১০ লাখে উন্নিত হবে। অর্থাৎ আগামী ১৫ বছরে আজকের তুলনায় অতিরিক্ত ১ কোটি ৭০ লাখ যুবক যুক্ত হবে আমাদের যুবসমাজে। আগামী ১৫ বছরে যুব জনসংখ্যা যে এখনকার তুলনায় প্রায় দেড়গুণ বৃদ্ধি পেতে পারে বিষয়টি শুধু সংখ্যাগত দিক থেকেই নয় জীবন কুশলতার (quality of life) দিক থেকেও অর্থবহ। কারণ অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে বাড়বে যুব-দারিদ্রের সকল মাত্রা; যুবকদের জীবন কুশলতা হবে নিম্নগামী। সংখ্যাগত দিক থেকেও বিষয়টি যথেষ্টমাত্রায় চ্যালেঞ্জিং, কারণ শুধুমাত্র অতিরিক্ত সংযোজনের মাত্রাটিই (অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লাখ নব সংযোজন) হবে আজকের অস্ট্রেলিয়া অথবা চিলি অথবা শ্রীলংকা অথবা সিরিয়ার মোট জনসংখ্যার প্রায় সমপরিমাণ। সুতরাং প্রক্ষেপিত যুব জনসংখ্যার বিষয়টি বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে যুব-দারিদ্র বিমোচনের ফলে বাড়ন্ত জনসংখ্যার সম্ভাবনাও যথেষ্ট মাত্রায় রোধ হবে। কি কি কারণে এই নূতন ১ কোটি ৭০ লাখ সংযোজিত হবে? জনমিতি বিজ্ঞানের নিরিখে ঘটনাটি ঘটতে পারে প্রধানত: তিনটি কারণে (রেখচিত্র ১-এ দেখানো হয়েছে): (১) ৫০% অর্থাৎ ১ কোটি ৭০ লাখের মধ্যে ৮৫ লাখ বৃদ্ধি পাবে 'পপুলেশন মোমেন্টামের' (population momentum) (জনসংখ্যার ধাক্কা অথবা কমবয়সী জনসংখ্যা পিছন থেকে অধিক হারে ধাক্কা দেবে) কারণে; (২) ৩৫% অর্থাৎ প্রায় ৬০ লাখ বৃদ্ধি পাবে 'অনাকাঙ্খিত/অনিয়ন্ত্রিত গর্ভধারণ/প্রসবের' (unwanted fertility) কারণে; (৩) আর ১৫% অর্থাৎ ২৫ লাখ বৃদ্ধি পাবে 'বড় সাইজের পরিবার গঠনের আকাঙ্খা' (high desired family size) থেকে (বিশেষত পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা থেকে)।

রেখাচিত্র ১: ২০২০ সনে বাংলাদেশের যুব-জনসংখ্যা; কত বাড়বে, কেন বাড়বে ও কি করা যায়।

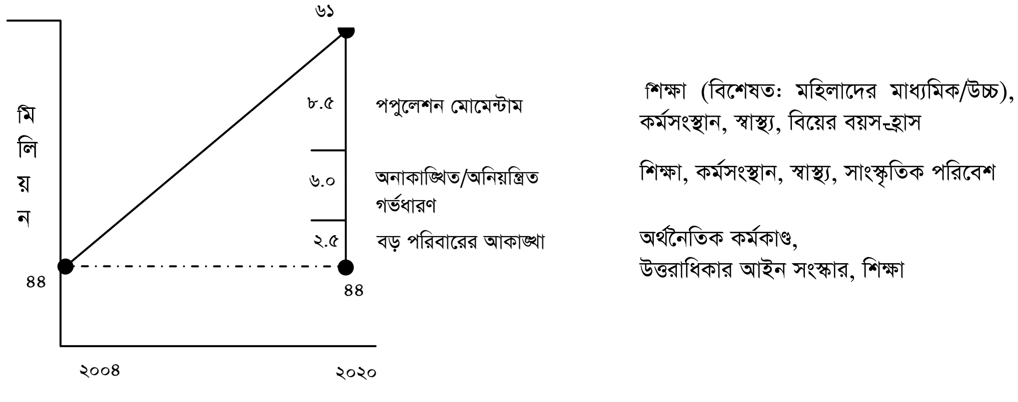

২০২০ সন নাগাদ পপুলেশন মোমেন্টাম-এর কারণে (অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে) মোট নবসংযোজনের (১ কোটি ৭০ লাখের) ৫০ শতাংশ অর্থাৎ ৮৫ লাখ যুব-জনসংখ্যা বাড়বে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে শুধুমাত্র পপুলেশন মোমেন্টামের কারণে ২০২০ সাল নাগাদ যুব সমাজে যে অতিরিক্ত ৮৫ লাখ নব সংযোজন ঘটবে তা আজকের সুইডেনের অথবা অস্ট্রিয়ার অথবা বলিভিয়ার অথবা রুয়ান্ডার মোট জনসংখ্যার সমান। মূল কথা হলো বাংলাদেশে এখনও জন্মের সংখ্যা মৃত্যুর চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি (জন্ম হার ২১, মৃত্যু হার ৫.৪), এবং জনসংখ্যা পিরামিডের নীচের দিকটা ভারি অর্থাৎ স্বল্প-বয়সী জনসংখ্যার তুলনামূলক পরিমাণ অধিক: যেমন ০-৯ বছর পর্যন্ত বয়সীরা জনসংখ্যার ২৭ শতাংশ, আর ১৫ বছর বয়স পর্যন্তরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। অর্থাৎ জনসংখ্যা প্রবৃদ্ধির হার হ্রাস পেলেও মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এমনকি প্রতিস্থাপন মাত্রা (replacement fertility : অর্থাৎ একজন মা সন্তান প্রসবক্ষম বয়স পেরুনোর সময় একজন মেয়ে সন্তান রেখে যাবেন যে পরবর্তীতে reproduce করবে)-অর্জনের পরেও প্রায় ৫০ বছর ধরে মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এ প্রক্রিয়ায় ২০২০ সনের যুবক (যাদের বয়স ২০২০ সনে ১৫ থেকে ৩০ বছর) হচ্ছে তারা যারা ১৯৯০ সন থেকে ২০০৫ সনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন (রেখাচিত্র ২-এ দেখানো হয়েছে)। অর্থাৎ ২০২০ সনের যুবকরা যে ১৫ বছরে (১৯৯০-২০০৫) জন্মগ্রহণ করার কথা তার ১৪ বছরই ইতোমধ্যে আমরা পার হয়ে এসেছি। অর্থাৎ আজ যাদের বয়স ১৪ বছর পর্যন্ত -- মোট প্রায় ৫ কোটি ৬০ লাখ, এরা সকলেই ২০২০ সনের যুবক। আর এ বছর ও সামনের বছরে (২০০৪-২০০৫ সালে) যারা জন্মগ্রহণ করবেন তারা ঐ ৫ কোটি ৬০ লাখের সাথে যুক্ত হয়ে ২০২০ সনের মোট যুব-জনসংখ্যার সমান হবে। সুতরাং ২০২০ সনের যুবকদের ৯২ শতাংশই কিন্তু ইতোমধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন। মনে রাখতে হবে যে ২০২০ সনের যে যুবকদের বয়স হবে ২০-৩০ বছরের মধ্যে অর্থাৎ যারা ১৯৯০-২০০০ সালের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছেন তাদের অধিকাংশই জন্মেছেন ও লালিত হচ্ছেন দরিদ্রাবস্থার মধ্যে– গ্রামাঞ্চলে এবং/অথবা শহরের বস্তিতে। তাদের অধিকাংশেরই শৈশব বঞ্চনা ও দুর্দশার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে এবং কৈশোর ভিন্নতর হওয়ার লক্ষণ এখনও স্পষ্ট নয়। কারণ মানব উন্নয়ন কাঠামোতে মৌলিক কোনো পরিবর্তন এখনও সাধিত হয়নি; প্রকৃত অর্থের ক্ষমতায়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়সমূহ এখনও বক্তৃতা, বিবৃতি ও সরকারি-বেসরকারি নথিপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এখন প্রশ্ন হলো যারা ইতোমধ্যে গত ১৪ বছরে জন্মেছেন এবং যারা এ বছর আর সামনের বছরে জম্মগ্রহণ করবেন--তাদের জন্য এমন কিছু চিন্তা করা যায় কি'না যা বাস্তবায়িত হলে যৌবন দারিদ্রমুক্ত হবে? 'পপুলেশন মোমেন্টাম' ইস্যুর নিরিখে দারিদ্রমুক্ত যৌবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য করণীয় বিষয়গুলো হতে পারে নিম্নরূপ: সবার জন্য সার্বজনীন-গণমুখি-বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা (বয়স্ক শিক্ষাসহ বিশেষত: মেয়েদের জন্য মাধ্যমিক/উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে), প্রশিক্ষণ ও দক্ষতার নিশ্চয়তা বিধান এবং এসব কর্মকাণ্ডের গতি বৃদ্ধি করা, ব্যাপক কর্মসংস্থান বিশেষত স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, উচ্চতর মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা সবার জন্য নিশ্চিত করা, মেয়েদের বিয়ের বয়স বৃদ্ধির লক্ষ্যে সব ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা, এবং এসব কিছুতেই রাষ্ট্র পর্যায়ের দৃঢ় সদিচ্ছা ও জনগণের অংশগ্রহণ প্রকৃত অর্থে নিশ্চিত করা।

রেখাচিত্র ২ঃ ২০২০ সনের যুবকদের জন্মসন

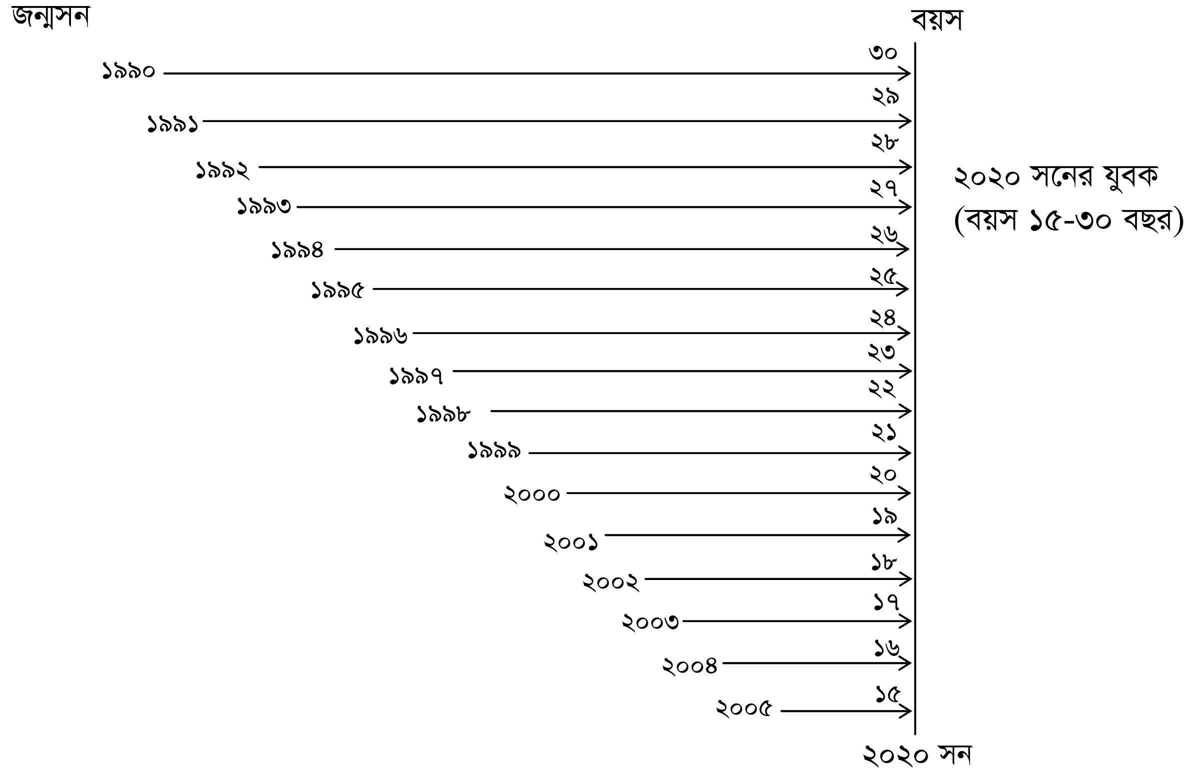

অনাকাঙ্খিত বা অনিয়ন্ত্রিত গর্ভধারণ/প্রসবের কারণে ২০২০ সাল নাগাদ যুবসমাজে অতিরিক্ত সংযোজন ঘটবে প্রায় ৬০ লাখ যুবক--অর্থাৎ প্রায় একটি সুইজারল্যান্ড অথবা হন্ডুরাস অথবা তাজাকিস্তানের আজকের মোট জনসংখ্যার সমান। এখানে উল্লেখ্য যে আমাদের কিশোর-কিশোরী ও যুবক-যুবতীরা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবাসহ প্রজনন স্বাস্থ্যের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে প্রায়ই অবগত নন, এবং অতীতে এ বিষয়ে জানানোর জন্য বিশেষ কোনো কার্যক্রম ছিল না বললেই চলে। অথচ আমাদের দেশে ১৫-১৯ বছর বয়সী যুবতীরা প্রজননক্ষম বয়সী মহিলাদের প্রায় ২০ শতাংশ। আমাদের দেশে কিশোর জন-উর্বরতা (adolescent fertility)-র হার অত্যধিক, ১৪৭ জন্ম (১০০০ মহিলা পিছু যাদের বয়স ১৫-১৯)-যা শ্রীলংকার চেয়ে পাঁচগুণ অধিক। কিশোরীদের প্রায় ৩০ ভাগ ইতোমধ্যেই মা হয়েছেন, আর ৬ ভাগ মা হতে চলেছেন (গর্ভবতী)। অর্থাৎ কিশোরীদের (যাদের বয়স ১৫ থেকে ১৯ অর্থাৎ যুবকদের প্রাথমিক স্তর) প্রতি তিনজনের একজন মাতৃত্ব শুরু করেছেন এমন বয়সে যখন যে কোনো বিচারেই গর্ভবতী হওয়াটা অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ। সবধরণের শিশুমৃত্যুর হার স্বল্পবয়সী মায়েদের ক্ষেত্রে অন্যবয়সীদের তুলনায় অধিক। স্বল্পবয়সী মেয়েদের বেশীরভাগই এসটিডি, এইচ আই ভি ও এইডস-এর কথা কখনও শুনেননি। স্বাস্থ্যের সকল ক্ষেত্রেই অপূর্ণ চাহিদা (unmet need) স্বল্পবয়সীদের মধ্যে অন্যদের তুলনায় অধিক। এ সম্পর্কিত আরো একটি বিষয় জোর দিয়ে বলা দরকার — যুবতীরা যুবকদের তুলনায় অনেক বেশি বৈষম্যের শিকার। যেমন এখনও বহু পরিবারে যুবতীরা যুবকদের পরে খাদ্যগ্রহণ করে ও সম্ভবত সবার চেয়ে কম খাদ্য পান (eat last and least); যুবকদের তুলনায় যুবতীরা দ্বিগুণ পুষ্টিহীন; যুবকদের তুলনায় যুবতীদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে কম নেয়া হয়; অসুস্থতা রিপোর্টিং এর ক্ষেত্রে যুবতীরা যুবকদের তুলনায় তিন গুণ পিছিয়ে। আর জীবন পরিচালনের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা যেখান থেকে উদ্ভব সেই পুঁজি, দক্ষতা, শিক্ষা, কর্ম কোনোটিরই উপর যুবতীদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত নয়। সুতরাং যুবক ও যুবতী উভয়ের ক্ষেত্রেই ‘দারিদ্র’ সাধারণ সমস্যা হলেও, এ সমস্যার বেশ কিছু দিক আছে যা

যুবতীদের দরিদ্রতর করে। দারিদ্রের এ বোঝা লাঘব করার ক্ষেত্রে শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রজনন স্বাস্থ্যসেবাসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই।

বড় সাইজের পরিবার গঠনের আকাঙ্খা বিষয়টি আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একটি তর্কাতিত বিষয়। সম্ভবতঃ এটির উদ্ভব পুত্রসন্তান (son preference) অথবা একাধিক পুত্রসন্তানের মালিক হওয়ার আকাঙ্খা থেকে। শুধুমাত্র এই আকাঙ্ক্ষার কারণেই ২০২০ সালের সংযোজিত যুব জনসংখ্যার ১৫ ভাগ বৃদ্ধি ঘটবে (যার পরিমাণ ২৫ লাখ)। গবেষণায় দেখা গেছে যে নিরক্ষরদের তুলনায় শিক্ষিত মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ অনেক বেশি, তাদের চিন্তাধারা আধুনিক, সন্তান সংখ্যা তুলনামূলক কম এবং প্রজনন-আচরণ উন্নততর। সুতরাং উল্লিখিত 'আকাংঙ্খা' উদ্ভুত সমস্যার প্রধান সমাধান হ'ল অধিকহারে মানব পুঁজির (human capital) জন্য বিনিয়োগ করা যা একদিকে যেমন যুবতীদের (যুবকসহ) ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করবে অন্যদিকে তেমনি শিশু মৃত্যুহার হ্রাস করবে। আর মৃত্যুহার বিশেষ করে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস জন্মহার হ্রাসের আবশ্যক পূর্বশর্ত। সেইসাথে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রসার ও উত্তরাধিকার আইনের সংস্কার 'বিশেষ করে সম্পত্তির ওপর মেয়েদের সমঅধিকার'– সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

যুব-দারিদ্র বিমোচনের চ্যালেঞ্জ: চাহিদা ও সরবরাহে ব্যাপক ফারাক

যুব-জনসংখ্যার পরিমাণ, প্রক্ষেপণ, যুব-দারিদ্রের প্রকৃতি ও করণীয় কিছু কথা ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। যুব-দারিদ্র বিমোচনে কি করা হয়েছে ও হচ্ছে- এ বিষয়ে আলোকপাত করার আগে দু'টি বিষয় খতিয়ে দেখা দরকার : শিক্ষা ও কর্মসংস্থান। সাম্প্রতিক একটি সরকারি রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে "যুবকরা হলো দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানব সম্পদ। এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ এবং মোট জনসংখ্যায় এদের আনুপাতিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এদের ৮০ ভাগ গ্রামে বসবাস করেন, কিন্তু এদের অধিকাংশের নিত্যসঙ্গি হলো চরম দারিদ্র। অধিকাংশই কখনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাবার সুযোগ পায়নি এবং এমন কোনো দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পায়নি যা দিয়ে উৎপাদনমুখী কিছু করা সম্ভব। দারিদ্র, সীমিত শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, অপ্রতুল কর্মসংস্থান এদের নিত্য সঙ্গী। সুতরাং এসব যুবককে মানব উন্নয়নের মূল ধারার সাথে সংযুক্ত করা আশু প্রয়োজন"স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮।

যুবকদের কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব পরিস্থিতি নিয়ে সঠিক তথ্যের অভাব আছে বিধায় বেশ কিছু অনুমানের ভিত্তিতে বাস্তব চিত্রের একটি প্রতিচ্ছবি স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে (দেখুন সারণি ৪০)। শুরুতেই উল্লেখ করা উচিত যে আমাদের দেশে যুবকরা মোট শ্রম শক্তির ৪০ শতাংশ হলেও তাঁরা মোট বেকারদের ৮৬ শতাংশ; যুবকদের মধ্যে মুক্ত-বেকারত্ব (open unemployment) ৩০ বছরের উর্ধ্বের বয়সীদের তুলনায় নয় গুণ বেশী (Masum 1998)।

দেশের মোট ৪ কোটি ৪০ লাখ যুবকদের ৮০ লাখ এখন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করছেন। অর্থাৎ কর্ম-যোগ্য (employable) যুব-জনসংখ্যার পরিমাণ ৩ কোটি ৬০ লাখ। ধরে নেয়া হয়েছে যুবক-যুবতীর সংখ্যা সমান (প্রত্যেকে ১ কোটি ৮০ লাখ)। আমাদের হিসেবে কর্ম-যোগ্য যুব জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ সম্পূর্ণ বেকার, এ হার যুবকদের ক্ষেত্রে ২২ শতাংশ আর যুবতীদের ৪৪ শতাংশ। অর্থাৎ ১ কোটি ২০ লাখ যুবক সম্পূর্ণ বেকার, যেখানে কর্মজীবীর সংজ্ঞাটা যথেষ্ট লিবারাল (সারণি ৪০-এর নোট দেখুন)। কর্মসংস্থানের যথেষ্ট লিবারেল সংজ্ঞা দিয়ে হিসেব কষলেও দেখা যাচ্ছে যে এদেশের মোট যুবকদের ২৭ ভাগই বেকার। আর যারা কর্মে নিয়োজিত, সরকারি হিসেবে তাদের প্রায় ৪৬ ভাগই পূর্ণ কর্মসংস্থান পাননি অর্থাৎ আধাবেকার (BBS 1997; LFS, 1995/96)। যুবকদের মধ্যে অর্ধবেকারত্বের হার ৫৪ শতাংশ যেখানে যুব পুরুষদের ক্ষেত্রে ৪০ শতাংশ আর যুবতীদের মধ্যে ৬০ শতাংশ। বেকারত্বের আসল চেহারাটা সম্ভবত সঠিক ধরা পড়ে এবং তা আরও প্রকট আকার ধারণ করে যদি সম্পূর্ণ ও অর্ধ-বেকার এক সংগে দেখা যায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে যুব-বেকারত্বের হার (কর্মযোগ্য জনসংখ্যার তুলনায়) হবে ৭৫ শতাংশ– যুবকদের ক্ষেত্রে ৫৬ শতাংশ ও যুবতীদের ক্ষেত্রে ৯৪ শতাংশ; আর মোট পরিমাণ হবে কর্ম যোগ্য ৩ কোটি ৬০ লাখ যুবকদের ২

কোটি ৭০ লাখ যার মধ্যে ১ কোটি যুব-পুরুষ ও ১ কোটি ৭০ লাখ যুবতী। আর এসব বেকারের অধিকাংশই গ্রামে বাস করেন এবং অধিকাংশই নিরক্ষর অথবা স্বল্প স্বাক্ষর এবং অদক্ষ, অপ্রশিক্ষিত।

আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত যুবকদের বেকারত্বের হারও ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিষয়টি সহজেই অনুমান করা যায় যখন আমরা দেখি যে বিসিএস পরীক্ষায় কয়েকশত চাকুরীর জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা কয়েক লাখ অথবা স্বাস্থ্য সহকারীর ৫০০ পদে আবেদনকারীর সংখ্যা ৮০,০০০। ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত বেকার যুবক বিষয়টি একদিকে যেমন অপরিসীম 'সামাজিক ক্ষতি' অথবা 'জাতীয় অপচয়'-এর নির্দেশক অন্যদিকে সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রচলিত শিক্ষার যৌক্তিকতা ও ফলপ্রদতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে।

সুতরাং বিশ্লেষণে স্পষ্ট যে যুব-দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান প্রশ্ন হলো ১ কোটি ২০ লাখ সম্পূর্ণ বেকার ও ১ কোটি ৫০ লাখ অর্ধ বেকার যুবকদের জন্য কি করা হয়েছে ও হচ্ছে? ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান যুব-বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কি করা যেতে পারে, কি করা সম্ভব, কে করবে? কর্মসংস্থানের বিভিন্ন দিক যেমন সময়, আয়, উৎপাদনশীলতা ও স্বীকৃতির বিষয়গুলি কিভাবে সুরাহা হবে? সরকারিভাবে একথা স্বীকৃত যে "যুব শক্তিকে মানবসম্পদে রুপান্তর জরুরি, কিন্তু কর্মকাণ্ডটি বিশাল" (পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, পৃ: ৫২৪)। কিন্তু আমার প্রশ্ন: যে

যে দেশে বছরে ১৫ কোটি বোতল ফেনসিডিল চোরাপথে আসছে,
যে দেশে ১০-১৫ লাখ অবৈধ অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে,
যে দেশে ইনজেকটেবল ড্রাগ সেবন কারীদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে,
যে দেশে যুবকদের ব্যাপকাংশ প্রতিনিয়ত অধিক হারে ভাগ্য-নিয়তিবাদীতে রূপান্তরিত হচ্ছে,
যে দেশে যুবকদের সামনে আদর্শ বলতে কিছু দেখানো যাচ্ছে না,
যে দেশে যুবকদের সামনে দেশের বিকৃত ইতিহাস পরিবেশন করা হচ্ছে,
যে দেশে যুবকদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধ যেন কাজ না করতে পারে সে ব্যবস্থা অহরহ চলছে,
যে দেশে ব্যপক জনগোষ্ঠিই দরিদ্র এবং অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দুর্বত্তায়নের শিকার–
সে দেশে সরকারি কাগুজে স্বীকৃতি "যুব শক্তিকে মানবসম্পদে রূপান্তর জরুরি"– কতটুকু কার্যকর হতে পারে?

সারণি ৪০: বাংলাদেশে যুবকদের কর্মসংস্থান ও বেকারত্ব পরিস্থিতি: ২০০৪

সূচক		সমগ্রদেশে[১]	যুবক[২] (১৫-৩০ বছর বয়সী)
কর্মযোগ্য (মিলিয়ন)	মোট	তথ্য নেই	৩৬
	পুরুষ		১৮
	মহিলা		১৮
কর্মজীবী (মিলিয়ন) (employed person)*	মোট	৬৩.৫	২৮
	পুরুষ	৩৭.৭	১৬
	মহিলা	২৫.৮	১২
অর্ধ বেকার (মিলিয়ন) (underemployed)*	মোট	২৮.৯	১৫
	পুরুষ	৭.৮	৬
	মহিলা	২১.১	৯
অর্ধ বেকারত্বের হার **	মোট	৪৫.৫	৫৩.৬
	পুরুষ	২০.৭	৪০.০
	মহিলা	৮১.৮	৬০.০
বেকার (মিলিয়ন)	মোট	তথ্য নেই	১২
	পুরুষ		৪
	মহিলা		৮
বেকারত্বের হার	মোট	তথ্য নেই	৩৩.৩
	পুরুষ		২২.২
	মহিলা		৪৪.৪

Notes: ১ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা দলিলের ভিত্তিতে প্রাবন্ধিকের হিসেব
২ প্রাবন্ধিকের হিসেব
* Employed person is a person who was either working one or more hours for pay or profit or working without pay in a family farm or enterprise or organisation during the reference period or found not working but had a job or business from which he/she was temporarily absent during the reference period.
** Those who worked less than 35 hours per week as percentage of the total number of employed population.

ইতোমধ্যে যুবকদের কেন্দ্র করে তাদের জন্য সরকারি-বেসরকারি যা করা হয়েছে সে সম্পর্কে এক কথায় অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক সরলরৈখিক একটি উপসংহার টেনে ফেলা সম্ভব। কারণ (১) যুবকদের ‘শিক্ষা’ ও ‘কর্মসংস্থানের’ যে বিপুল চাহিদার হিসেব দেয়া হয়েছে তার সাথে তুলনা করলে বলা চলে এমন কোনো পরিকল্পনা কখনও নেয়া হয় (যায়)নি যার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল ঐ চাহিদা পূরণ করা। অর্থাৎ চাহিদা ও যোগানের ফারাক ছিল আকাশ-পাতাল। যুবকরা তো দেশের মোট জনসংখ্যার ৩১ শতাংশ, কিন্তু তাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে সরকারি বাজেটের ৩১ শতাংশ বরাদ্দ আছে কি? দরিদ্র যুবকরা তো দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৯ শতাংশ– তাদের জন্য কি বাজেটের ২৯ ভাগ বরাদ্দ করা হয়? এ বরাদ্দ কি বাজেটের ৫ শতাংশ হবে? কোথায় সে বরাদ্দ? দারিদ্র হ্রাস নিয়ে যে এত কায়দা-কৌশল পত্র প্রণয়ণ হলো সেখানে যুব দারিদ্র বিষয়টি আদৌ আছে কি? আসলে শর্ষের মধ্যেই ভূত। (২) সরকারের প্রতিটি পরিকল্পনায় ভৌত (ফিজিক্যাল) ও আর্থিক টার্গেট শুধু স্বল্পমাত্রায় ছিল তাই নয়, কোনো পরিকল্পনা পর্বেই ঐ স্বল্প টার্গেটও পূরণ হয়নি; (৩) স্বল্প-মাত্রার টার্গেটও যে পূরণ হয়নি তার কারণ হিসাবে সবসময়ই অন্যের দোষকে প্রাধান্য দিয়ে “উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে” পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে (এটা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে)।

যুব দারিদ্র বিমোচনে সরকার-অসরকার নির্বিশেষে সামগ্রিক চিত্রটি শুধুমাত্র হতাশাব্যঞ্জকই নয় বরঞ্চ ভয়াবহ-বিষয়টি বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে

একধরণের সমন্বিত ধারণার-এর কথা বলা হ'ল এবং তার আওতায় যুব-হোস্টেল ও যুব-কল্যাণ কেন্দ্র স্থাপন করা হ'ল। পরবর্তী সরকারের আমলে সংকীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে হাতিয়ার হিসেবে যুবকদের ব্যবহার করা হ'ল। প্রথম দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৮-৮০) মাত্র ৩৬,২০০ জন বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া হ'ল (যা আবার সরকারি টার্গেটের ৮৬%), এবং যুব-উন্নয়নে ব্যয় করা হল ৭ কোটি টাকা (যা নির্ধারিত ব্যয়ের ৭৪%)। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনাকালে (১৯৮০-৮৫) ১৬০,০৭০ জন যুবককে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে প্রশিক্ষণ দেয়া হল এবং যুব উন্নয়নে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হল যা যথাক্রমে নির্ধারিত টার্গেটের ৭৪ শতাংশ ও ৭৭ শতাংশ। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার (১৯৮৫-৯০) আওতায় যুব উন্নয়নে ১৭ কোটি টাকা ও পরবর্তীতে “থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্পের” (থারডেপ)-আওতায় ৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হল। শেষোক্ত বরাদ্দের বিপরীতে দারিদ্র বিমোচনের আওতাভূক্ত কর হল মাত্র দুটি থানা। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)-র আওতায় মোট ৩০৪,৩৮৮ জন যুবক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ নিল (যা সরকারি টার্গেটের ৮৫%); প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের জন্য মাইক্রো-ক্রেডিট-এর সুযোগ রাখা হল মোট ৮৭ কোটি টাকা আর ছাড় হল মোট বরাদ্দের মাত্র ৩৫ ভাগ; যুব উন্নয়ন কর্মসূচির ৮০ কোটি টাকার ১০ টি প্রকল্পের ৫টি প্রকল্প সময়মত সম্পন্ন হল; থারডেপ-এর ‘সাফল্যের’ ভিত্তিতে ৫০টি থানার জন্য ১২৫ কোটি টাকার “পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচি” গ্রহণ করা হল; যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও জোনাল রিসোর্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হল। দ্বিতীয় দ্বিবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৯৫-৯৭) আওতায় মোট বরাদ্দের (১৩৪ কোটি টাকা) মাত্র ৬৮ ভাগ ব্যয় হ'ল। শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে মোট ১০ টি প্রকল্পের মধ্যে ৯টি প্রকল্পই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার আওতাভুক্ত করতে হ'ল যার আর্থিক দায়ভার ৪০০ কোটি টাকা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২)-য় যুব-দারিদ্র বিমোচনে প্রতিশ্রুতি ছিল অতীতের তুলনায় অধিক। এ লক্ষ্যে যা যা করা হবে বলা হয়েছিল সেগুলো হ'ল নিম্নরূপ: যুবকদের স্ব-উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের জন্য উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, মাইক্রো-ক্রেডিট, অন্যান্য ইনপুট সরবরাহ; যুব উন্নয়ন কর্মসূচিতে মহিলাদের অধিকতর হারে সম্পৃক্তকরণ; কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও পেশাগত উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক স্তরে যুবকদের সম্পৃক্তকরণ; জাতি গঠনে যুবকদের সম্পৃক্তকরণ; সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুবকদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণ; এবং স্ব-সাহায্য-সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সুনাগরিক হিসেবে যুবকদের গড়ে তোলার স্পৃহা কর্ষণকরণ ইত্যাদি। যুব দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ, স্ব-কর্মসংস্থান কর্মসূচি, কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচি, যুব নেতৃত্বের বিকাশ, জনসংখ্যা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক কর্মকাণ্ডে যুবকদের অংশগ্রহণ, স্ব-কর্মসংস্থান কর্মসূচি, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের জাতিগঠনমূলক সমাজসেবায় অংশগ্রহণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যে উপকরণ সরবরাহ, জাতীয় যুবকেন্দ্র স্থাপন, প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচি–এসব কর্মকাণ্ডের কথা বলা হয়েছে। টার্গেট নির্ধারিত হয়েছিল যে ২০০২ সাল নাগাদ থারডেপ-এর আওতায় ৫৫০,০০০ গ্রামীণ যুবক স্ব-কর্মসংস্থানে ঋণ পাবেন এবং মাইক্রো-ক্রেডিট পাবেন সর্বমোট ৮০০,০০০ যুবক। বরাদ্দ করা হয়েছিল মোট ৬২৮ কোটি টাকা। সেই সাথে ধরে নেয়া হয়েছিল যে বেসরকারি সংস্থা ও প্রাইভেট সেক্টর যুবউন্নয়নে আনুমানিক ২১০ কোটি টাকা ব্যয় করবে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা থেকে আজ পর্যন্ত–এ সুদীর্ঘ তিন দশকে যুব-দারিদ্র বিমোচনে ব্যর্থতার এই দায়ভার, সরকারি দলিলানুযায়ী (দেখুন: পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনা, পৃ: ৫২৫) “যত দোষ নন্দ ঘোষ” অর্থাৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই (যদি প্রাধান্য অনুযায়ী লেখা হয়ে থাকে) যুবকদেরই। যেমন বলা হয়েছে “কমিউনিটির পক্ষ থেকে অপর্যাপ্ত সমর্থন; কমিউনিটির অংশগ্রহণের অভাব; স্থানীয় সরকারের অংশগ্রহণের অভাব; যুবকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ নয় এবং সংগঠিত নয়; যুবকদের সমস্যার বিভিন্ন মাত্রা সম্পর্কে তথ্যের অভাব” ইত্যাদি (তথ্য উৎস: ঐ পৃ: ৫২৫)। বাংলাদেশের ২ কোটি ৭০ লাখ বেকার ও অর্ধবেকার যুবক কর্মসংস্থান চায় না, দারিদ্র-বিমোচন চায় না, এ বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে চায় না-এসবের কোনোটিই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে দুর্বৃত্তায়িত বাংলাদেশে সমস্যা অন্য কোথাও। এবং সেটা খতিয়ে দেখা আশু প্রয়োজন। কারণ সামগ্রিকভাবে যুব-দারিদ্র পরিস্থিতি ভয়াবহ।

পঞ্চম পঞ্চমবার্ষিকি পরিকল্পনার অঙ্গিকার নিয়ে তিনটি প্রশ্ন করা সমীচীন বলে মনে হয়। প্রথম: যুব-দারিদ্রের যে বিশাল মাত্রার কথা এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে তার তুলনায় যা করার কথা অঙ্গীকার করা হয়েছে সেটা কি নগণ্য নয়? দ্বিতীয়: পঞ্চবার্ষিকি দলিল যখন নিজেই স্বীকার করেছে যে যুব-সমস্যার বিভিন্ন মাত্রা ও তার গভীরতা সম্পর্কে আমরা অবগত নই (তথ্যের অভাব ইত্যাদি) তখন একথা ধরে নিতে পারি যে আর্থিক বরাদ্দ ও ফিজিক্যাল টার্গেট সম্পর্কে পরিকল্পনায় যা কিছু আছে সেগুলির তথ্যভিত্তি দূর্বল অথবা "অগ্রধানের" (prioritization)- বিষয়টি স্পষ্ট নয় অথবা পরিকল্পিত বরাদ্দ বিশ্লেষণে সেগুলি বিচার করা হয়নি? তৃতীয়: এমন কোনো কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে কি যা দেখে বলা যাবে যে চলতি পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার শেষে অতীতের মত বলতে হবে না যে আমরা অঙ্গীকার পূরণে ব্যর্থ হয়েছি কারণ......?

যুব দারিদ্র বিমোচনে যুবকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি উদ্যোগ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা মূলত ক্ষুদ্র-ঋণ সরবরাহ করেন প্রধানত তাদের মধ্যে যাদের জমি সম্পদ আছে অথবা যারা ইতোমধ্যে স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। এদের অধিকাংশই যুব-বয়সসীমার বাইরে। যুবকদের মধ্যে যারা শ্রমবাজারে নূতন তাদের সাথে উল্লিখিত ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মকাণ্ডের বিশেষ কোনো যোগসূত্র নেই। এসব বেসরকারি সংস্থার এমন কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি নেই যা ব্যাপক দরিদ্র যুবগোষ্ঠির দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানে (স্ব-কর্মসংস্থানসহ)-র সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম। বেসরকারি সংস্থার মধ্যে যারা যুবকদের জন্য কর্মযোগ্য-দক্ষতা বৃদ্ধির কাজে নিয়োজিত তাদের বিস্তৃতি উল্লেখযোগ্য নয়। কোনো কোনো বেসরকারি সংস্থা আবার নাগরিক অধিকার ও মানব-অধিকার নিয়ে কাজ করছেন। যুব-দারিদ্র বিমোচনে এসব কর্মকাণ্ডের অভিঘাত এখনও স্বল্প এবং সুনিশ্চিতভাবে বলার মত নয়।

তা হলে করণীয়?

বাংলাদেশের যুব-দারিদ্রের ব্যাপকতা ও দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে হতাশাব্যঞ্জক যে চিত্রটি এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত হয়েছে সেটাই প্রকৃত বাস্তবতা বলে আমি মনে করি। এ বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে হতাশাব্যঞ্জক চিত্রটি চিরস্থায়ী। যুবকরা তো দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ– সর্বোচ্চ উৎপাদনক্ষম, সর্বোচ্চ কর্মক্ষম, সর্বোচ্চ সৃজনশীল, সর্বোচ্চ সাহসী। ভাষার লড়াই থেকে মুক্তিযুদ্ধ এবং পরবর্তীতে স্বৈরাচার বিরোধি আন্দোলন–যুবকরাই ছিল মূল শক্তি। যুবকদের যখন জাতী গঠন, রাষ্ট্র গঠন ও উন্নয়নে প্রধানতম ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার কথা তখন তারা থাকবে দরিদ্র– এ এক সীমাহীন জাতীয় ক্ষতি, সামাজিক অপচয়। আজকের যুবকরা তো ভবিষ্যতের নেতা। যুব-দারিদ্রাবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে যুবকদের সাথে দেশের ভবিষ্যৎও তো সংকটাপন্ন। সুতরাং দরিদ্র যুবগোষ্ঠিকে সুপরিকল্পিতভাবে মানব সম্পদে রুপান্তরিত করতে হবে। যুব-দারিদ্রকে মানব সম্পদে রূপান্তরণের প্রক্রিয়াটি যথার্থ শুরু করতে পারলেই আস্তে আস্তে দারিদ্র বিমোচিত হবে এবং আশার সঞ্চার হবে। এ প্রক্রিয়ায় যুবকদের জন্য বিভিন্ন ধরণের সুযোগ (bundle of opportunities) সৃষ্টি করতে হবে —আর এ সুযোগগুচ্ছ থেকে প্রতিটি যুবক নিজের জন্য নিজেই চয়ন করবে নির্দিষ্ট সর্বশ্রেষ্ঠ সুযোগটি। "যুবকদের সক্ষমতা বৃদ্ধি"– সামাজিক চয়নের এ বিষয়ে রাষ্ট্র ও সরকার উভয়কেই অতীতের তুলনায় অনেক বেশি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দায়বদ্ধ, ও সক্রিয় হতে হবে। এ বিষয়ে স্লথ গতি অথবা ব্যর্থতা অধিকতর বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে। সেক্ষেত্রে সমগ্র উপরিকাঠামোর জনকল্যাণমুখী পরিবর্তন অনিবার্য হতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় মুক্তির চেতনায় সমৃদ্ধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ যুব সমাজ নিজেই ও তাদের শ্রম হবে সবচে বড় শক্তি ও সম্পদ।

সারণি: যুবকদের ক্ষমতায়নে সুযোগ গুচ্ছ

সুযোগের ধরন	করণীয় বিষয়সমূহ
১. অর্থনৈতিক সুযোগ	• কর্মসংস্থান সৃষ্টি (আত্ম-কর্মসংস্থান) • দক্ষতার উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ ও পরিচিতি) • সরকারী সম্পদের উপর অধিকার এবং মালিকানা প্রতিষ্ঠা (ভূমি, জলা) • ঋণ প্রাপ্তির অধিকার • বাজার সম্পর্কিত জ্ঞান • সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, প্রভাব বৃদ্ধি, এ্যাডভোকেসি
২. সামাজিক সুযোগ-সুবিধা	• শিক্ষা • স্বাস্থ্য • সামাজিক নিরাপত্তা • সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, প্রভাব বৃদ্ধি, এ্যাডভোকেসি
৩. রাজনৈতিক স্বাধীনতা	• সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ • স্থানীয় শাসন কার্যক্রম • সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, প্রভাব বৃদ্ধি, এ্যাডভোকেসি
৪. স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা	• জবাবদিহিতা • সরকারী খাতের সেবা প্রদান কার্যক্রমে যুবকদের অংশগ্রহণ • সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, প্রভাব বৃদ্ধি, এ্যাডভোকেসি
৫. সুরক্ষারমূলক নিরাপত্তা	• বেকার ভাতা • আইন শৃঙ্খলা • বয়স্ক মানুষ এবং প্রান্তিক মহিলাদের সামাজিক নিরাপত্তা • নিরাপত্তা কার্যক্রম • সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান, প্রভাব বৃদ্ধি, এ্যাডভোকেসি

উৎস: ‘Young People in Bangladesh: Problems and chances’; keynote papers for presentation at the Sixth Annuel workshop 2006, organized by Die Lichtbruccke e.v. Germany, Dhaka, January 27, 2006.

প্রকৃত অর্থে যে দেশে শৈশব ও কৈশোর উপেক্ষিত ও সুখকর নয় সেখানে যৌবন কিভাবে দারিদ্রহীন হতে পারে? অর্থাৎ মানব সম্পদ বিকাশের বিষয়টিকে দেখতে হবে জীবন চক্রের (life cycle) নিরিখে। যে চক্রের কোনো পর্বই উপেক্ষিত হতে পারবে না। সুতরাং যুব-দারিদ্রের বিষয়টি বিচ্ছিন্নভাবে (isolated) না দেখে সেটা দেখতে হবে মানব উন্নয়ন কাঠামোর অঙ্গীভূত একটি অখণ্ড, পরিপূর্ণ ধারণা হিসেবে। আমাদের চিন্তন কাঠামোর এই পরিবর্তন এবং সেটা বাস্তবায়ন করতে পারলে অবশ্যই একবিংশ শতকের প্রথম দিকেই যুব-দারিদ্রসহ সমগ্র দারিদ্র বিমোচন কর্মকাণ্ড সঠিক ধারায় প্রবাহিত হবে। এ বিশ্বাস যুক্তিসঙ্গত।